PANCHAKOTesSAYS
ISSN : 0976-4968
Vol-13, No.-1, May 2022

দেশভাগ-দেশত্যাগ : বাংলায় নিম্নবর্ণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন

ডঃ সুমিত কুমার মন্ডল [1*]

[1*] সহকারী অধ্যাপক, গোবিন্দ প্রসাদ মহাবিদ্যালয়, অমরকানন, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ.
Email: mondalsumit201617@gmail.com

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন যুগ থেকে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় উচ্চবর্ণের সাথে নিম্নবর্ণের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তী সময়ে এই বিভাজন আরো সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় হয়। সময়ের সাথে সাথে এই নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যে একতার সৃষ্টি হয় এবং তারা সামাজিক কুপ্রথা ও বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে। ভারতে ঔপনিবেশিক শক্তির আগমনের পরে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার সূচনা হয়। ধীরে ধীরে জাতীয়বাদী যুগে নিম্নবর্নের মানুষেরা পৃথক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হতে শুরু করেন। এর ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হয়। ভারত বিভাজনের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অবস্থার কীভাবে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন কতটা নিম্নবর্নের মানুষের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই নিবন্ধে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সাংকেতিক লিপি- নিম্নবর্ন, ভারত বিভাজন, উদ্বাস্তু সমস্যা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক আলোচনা।

বিভাজন পূর্ববর্তী আর্থ-সামাজিক পটভূমি-

নমশূদ্র পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল তফসিলি জাতি (2001 সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে)। ঔপনিবেশিক আমল থেকে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তফসিলি জাতির নমশূদ্র উপ-জাতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তারা উচ্চশ্রেণির হিন্দুদের থেকে প্রান্তিক ছিল। তাই তারা তাদের অধিকারের জন্য প্রতিবাদ করে ঔপনিবেশিক ভারতে তাদের নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছিল। যেহেতু নমশূদ্র মূলত বাংলার একটি কৃষক সম্প্রদায় ছিল তাই ফরিদপুর, বাকেখগঞ্জ, খুলনা প্রভৃতি জেলায় উচ্চবিত্ত হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলিম জমিদারদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে সমাজে আর্থ-সামাজিক উন্নতির জন্য প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। তারা ওড়াকান্দির হরিচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায় 'মতুয়া' গঠন করে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গঠন হতাশাগ্রস্ত দুঃস্থ মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল। শুধু নমশূদ্ররা নয়, তফসিলি জাতির অন্যান্য উপ-জাতি যেমন- রাজবংশী, মাল, শুঁটি এবং অন্যান্যরাও এতে যোগ দেয়। মতুয়াদের লক্ষ্য সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। আন্দোলনের প্রথম সময়কালের লক্ষ্য ছিল আর্থ-সামাজিক বিষয়ে উন্নতি সাধন। C.S.Mead, তৎকালীন ফরিদপুর মিশনের একজন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক তার বই 'The Namasudras and the other addresses' এ নমশূদ্রের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে "আমরাও মানুষ ; সেই একই মহান ঈশ্বর যিনি গর্বিত ব্রাহ্মণ তৈরি করেছেন আমাদেরও তৈরি করেছেন, এবং আমাদের হৃদয়ে আছে একটি উন্নত ও বৃহত্তর জীবনের জন্য। আপনি কি আমাদের সাহায্য করবেন?"[i] জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়, তারা ব্রিটিশদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিল তাই জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ আন্দোলনে অংশ নেয়নি। হরিচাঁদ ঠাকুরের পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে তারা এই নিম্নবিত্ত বর্ণের নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সাক্ষরতা কর্মসূচিতে মনোযোগী হয়েছিল। বাংলার জনপ্রিয় নেতারা এবার অনেক ইস্যুকে সংস্কার করলেও তারা এই জাতপাতের বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন। খ্রিস্টান মিশনারী এবং

ঔপনিবেশিক সরকারের সহায়তায় তারা নিজেদের জন্য শিক্ষা খাত প্রতিষ্ঠা করে। ধীরে ধীরে তারা রাজনীতিতে তাদের নিজস্ব পরিচয় তৈরি করে। এমনকি স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতারা (প্রধানত কংগ্রেস পার্টি) নমশূদ্রদের অংশগ্রহণ চেয়েছিলেন কিন্তু তারা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। ধীরে ধীরে তারা রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাতি পিআর ঠাকুর অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন। বিশ শতকের পূর্ব থেকে তারা রাজনৈতিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করেছিল। যদিও নমশূদ্র বর্ণের বৈষম্য নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব উপস্থিত ছিল, তাদের আলাদা গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় তৈরি করেছিল। বিভিন্ন আসনেও অনেক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু ভারত ভাগ হলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। পুরো আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা হঠাৎ বদলে গেল। এখানে আলোচ্য বিষয় কীভাবে বিভাজন পরিবর্তন আনে এবং বর্তমান দিনেও এটি কীভাবে প্রভাবিত হয়। জনসংখ্যা- নমশূদ্র জনসংখ্যা প্রধানত আসাম, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, ওড়িশা, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করে। এই নিবন্ধে মূলত পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে আলোচনা আছে। দেশভাগ বেশিরভাগ মানুষের জন্য পুরো দৃশ্যপট বদলে দিয়েছে। ধর্মভিত্তিক ভূমি বিভাজন সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যাযুক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। অতীতে নমশূদ্র এবং মুসলমানদের মধ্যে একটি মহান সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল কারণ উভয় কৃষক সম্প্রদায়ই উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু এবং মুসলিম জমিদারদের দ্বারা আধিপত্য ছিল। যদিও বহু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তপশিলি জাতি ও মুসলমানদের মধ্যে হয়েছে। আমরা তফসিলি জাতির সঠিক সংখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না তবে "শুধু 1955 এবং 1956 সালে দুটি পৃথক তালিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির সর্বশেষ সংশোধনী আদেশ জারি করা হয়েছিল 1976 সালে। সেই আদেশ অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে 59টি তপশিলি জাতি রয়েছে।"[ii] 2001 সালের আদমশুমারি অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গে 60টি এবং ভারতে 1284টি তফসিলি জাতি রয়েছে। মোট নমশূদ্র পুরুষ জনসংখ্যা 1,809,191 এবং মহিলা 1,695,451 জন। সাক্ষরতার হার হল পুরুষদের মধ্যে 85.1%, মহিলাদের মধ্যে 73.6% এবং গড়ে 79.5% (2001 সালের আদমশুমারি অনুসারে)। এটি প্রমাণ করে যে নমশূদ্ররা নিজেদের বিকশিত করেছিল।

রাজনীতির অংশগ্রহণ- গুরুচাঁদ ঠাকুর রাজনীতিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত নেন। একদিকে জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে আধিপত্য ছিল উচ্চশ্রেণির হিন্দুরা যারা নমশূদ্রদের প্রতি অত্যাচার, দুর্ব্যবহার করত এবং অন্য দিকে ঔপনিবেশিক সরকার কৃষকদের ওপর অত্যাচার করত। হরিচাঁদ ঠাকুরের সময়ে ইংরেজরা কৃষকদের উপর অত্যাচার চালাত। নীল চাষের জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর প্রতিবাদ করেন এবং নীল কারখানার দিকে অগ্রসর হন। কোম্পানির কর্মকর্তারা প্রতিবাদের তীব্রতা দেখে সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন। এই প্রতিবাদ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে। গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাতি পি.আর. ঠাকুর তাঁর জীবনীতে লিখেছেন যে- "অসহায় দরিদ্র বাঙ্গালী প্রজাদিগের অত্যাচার, ইংরেজের ভারত শাসনের ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া বসিয়াছে। পিতামহের (গুরুচাঁদ ঠাকুর) নিকট শুনিয়াছি ইহাদিগের অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া ওড়াকান্দির নিকটস্থ জোনাসুর গ্রামের লোকেরা এক নীলকুঠির সাহেবকে নীল প্রস্তুত করিবার কড়াইতে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি সংযোগে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়াছিলো"[iii] । প্রতিবাদ সে অর্থে সফল না হলেও এটি তৎকালীন সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত রুপে দেখা দিয়েছিল।

এরই মধ্যে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী উন্মেষ ঘটে। মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে এটি সাধারণ জনগণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। উচ্চবর্ণীয় ও উচ্চবিত্তদের মধ্যে থেকে ছড়িয়ে পড়ে নিম্নবর্ণীয়দের মধ্যে। সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক মূল্যবোধের চেতনার বিকাশ এবং প্রকাশ ঘটে। "নিম্নবর্ণীয় (1936 থেকে তপশিলি জাতি) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনাবোধ ও সামাজিক অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রবণতার বাইরে ছিল না। 1910, 1920,1930 এর দশকে নিম্নবর্ণীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্যায় প্রথা সমূহের মূলচ্ছেদ করে সামাজিক ন্যায়বিচার(Social justice) প্রতিষ্ঠার অগ্রসর হয়েছিল"।[iv]

নিম্নবর্ণীয়দের রাজনৈতিক যোগদান

ব্রিটিশ সরকার ও খ্রিস্টান মিশনারীদের সাহায্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা লাভের সুযোগ ঘটে।1872 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে বলা যায় "বাংলার 18 জন মানুষ তথাকথিত নিম্নবর্ণিয় সম্প্রদায়ের।... 1936 খ্রীঃ ঔপনিবেশিক বাংলায় 76 টি জাতিকে তপশিলি জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।"[v] তাদের মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন মতুয়া সম্প্রদায় তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ জাতির সমান মর্যাদা লাভ করার চেষ্টা করেন। অনুরুপভাবে পঞ্চানন বর্মা ও মধুসূদন সরকারের নেতৃত্বাধীনে রাজবংশী সম্প্রদায় ক্ষত্রিয় জাতির সমান মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য একত্রিত হয় এবং 1910 খ্রীঃ-এ 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে জাতীয় রাজনীতিতে সংযুক্তকরনের ঢেউ ওঠে। এর সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখা যায় 1937 খ্রীঃ-এ যখন হিন্দু মহাসভা এবং জাতীয় কংগ্রেসে নিম্নবর্ণীয় মধ্যবিত্তরা অংশগ্রহণ করা শুরু করে। 1938 খ্রীঃ-এ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠার পরবর্তীতে, এই দলেও তপশিলি জাতির প্রতিনিধির অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। এর ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে দলভিত্তিক রাজনীতিতে সমগ্র তপশিলি জাতি বিভক্ত হতে শুরু। দলগত এবং আদর্শগত বিভেদের ফলে জাতিগত একতাও নষ্ট হয়। পূর্বেই তপশিলি জাতির মধ্যে উপজাতির বিভাজন ঘটেছিল, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য উপজাতি গুলির মধ্যেও বিভাজন ঘটে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে- নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে মতুয়াদের প্রভাব সর্বাধিক ছিল। পরবর্তীতে এর মধ্যেও মতপার্থক্য ও বিভাজন দেখা যায়। এছাড়াও বড় বড় রাজনৈতিক দলের মধ্যে নিম্নবর্ণীয় নেতারা যোগদান করলেও অন্যান্য প্রার্থীদের সাথে এদের একটি সীমারেখা ছিল। রাজনৈতিক স্বার্থে বড় বড় রাজনৈতিক দল নিম্নবর্নীয় নেতাদের যোগদান স্বীকার করত। এতে সাধারন নিম্নবর্ণীয় মানুষেরা সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হতে। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল (নমঃশূদ্র নেতা) এবং নগেন্দ্রনাথ রায় (রাজবংশী নেতা) তপশিলি জাতির ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত ছিলেন। সামাজিক সম্মানের জন্য নিম্নবর্ণিয়দের রাজনৈতিক যোগদান বিভাজনের সৃষ্টি করেছিল। ভারত বিভাজন পূর্ববর্তী সময়েই নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিল। এর প্রভাব বিভাজন পরবর্তী সময়েও প্রতিফলন পড়ে এবং পরবর্তীতে আরো আর্থ-সামাজিক কারন বশত এটি আরো ভয়ঙ্কর সমস্যার সৃষ্টি করে।

বিভাজন পরবর্তী রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক অবস্থা-

ভারত বিভাজনের পরবর্তী সময়ে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। সব শ্রেণীর মানুষের ওপর প্রতিপত্তিশালী মানুষেরা পরিবর্তনের আঁচ পেয়ে আগে থেকেই অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয়। সমস্যা দেখা দেয় সাধারণ মানুষের উপর। পাঞ্জাব ও বাংলার সাধারণ মানুষের উপর বিপদ ঘনিয়ে এল। "যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানে ওইসব রাজনৈতিক ক্ষমতাবান নেতৃত্বের অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিলেন, তাই তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের যেভাবে দেখলেন তার শতাংশ সুযোগ পেলেন না বাংলার রিফিউজিরা।... পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুরা যেখানে ৮ একর থেকে ২০ একর জমি দেওয়া হয়েছে, বাংলার উদ্বাস্তুরা পেয়েছে ৩ একর থেকে মাত্র ১ কাঠা জমি পর্যন্ত। পরে যারা গিয়েছেন তারা কিছুই পাননি।তাদের নামই হয়ে গেছে- উইদাউট।"[vi]

১৯৪৭ সালেই বাংলা বিভাজন রেখা স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিভাজনের প্রথম দিকে নমঃশুদ্ররা সর্বস্ব ত্যাগ করে বাংলায় আসতে পারেননি। "নমঃশুদ্রদের মধ্যকার আম্বেদকর অনুগামী অংশ এমনকি মতুয়া অনুগামী সাধারন মানুষও দাঙ্গা, নিরাপত্তাহীনতা ও সর্বস্ব ত্যাগ করে পশ্চিমভঙ্গে আসার ঝুঁকি নিতে পারেননি। তাছাড়া ফেডারেশন পন্থীদের (Scheduled Caste Federation) রাজনৈতিক নিরাপত্তা দানের প্রচার প্রথম দিকে তাদের স্থায়ী নিবাস ত্যাগ না করার ইন্ধন বা সাহস জুগিয়েছিল। কিন্তু পূর্ববঙ্গে বসবাসকারী উচ্চবর্ণের মানুষ ১৯৪৮-৪৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের চলে আসেন।"[vii] নিম্নবর্ণের মানুষেরা মূলত ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে বাধ্য

হয়েছিল। এছাড়াও নিম্নবর্ণের উদ্বাস্তুদের বিলম্বিত আগমনে আরেকটি কারন হল- নমঃশূদ্র নেতা যোগেন মন্ডলের রাজনৈতিক চিন্তা তিনি ১৯৪৬ খ্রীঃ মহম্মদ জিন্নার কর্তৃক অন্তর্বর্তী মন্ত্রী সভায় মুসলিম লিগের প্রতিনিধি মনোনীত হন। তিনিই পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রীও হন। ইতিপূর্বেই কংগ্রেস রাজনৈতিক কার্যকলাপে নিম্নবর্ণের প্রতি বিভেদের প্রমান পাওয়া গেছে। সাধারন নমঃশূদ্র মানুষের দ্বিধায় পড়ে যায়। মুসলিম অধ্যুষিত পাকিস্তান প্রদেশের আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায়-১৯৫৬ সালের সংবিধান রচনার পরবর্তীকালে। এই সংবিধানের ওপর ভিত্তি করে পাকিস্তানকে "মুসলিম প্রজাতন্ত্র" বলে ঘোষিত হল। "সংবিধানে ঘোষনা করা হল মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের মানুষ পাকিস্তানে ইসলামীয় রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই হিন্দু আগমনের মাত্রা বাড়তে থাকল।"[viii] এর ফলস্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ধর্ষণ, অত্যাচার ও হরতালের মাত্রা বাড়তে থাকল। যদিও যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী নিয়োগ হন এবং পাকিস্তানের সরকার এই আশ্বাস দেয় যে- মুসলিম লিগ যদি নমঃশূদ্র জাতির সমর্থন পায় তাহলে নমঃশুদ্রদের দেশত্যাগ করতে হবে না। কিন্তু এই সময়ে পূর্ববঙ্গের অবস্থা ভালো ছিল না। অনবরত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হিন্দুদের পূর্ববঙ্গে টিকে থাকা দায় হয়ে উঠেছিল। যোগেন মন্ডলের অভয়বাণী সত্ত্বেও নমঃশুদ্রদের তাদের প্রান বাঁচানোর জন্য ভিটেমাটি ছেড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু রাষ্ট্র পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। "১৯৫০-৫৬ সালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বেশীরভাগ নমঃশূদ্র মানুষের কাঁটাতার পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের আসেন। স্বয়ং যোগেন্দ্র নাথ মন্ডল পাকিস্তানের সরকারের কাছে পদত্যাগপত্র দেন। এর মাধ্যমে নমঃশূদ্র জাতির ভিটেমাটিতে থাকার শেষ আশা ও ত্যাগ হয়"।[ix] এর সাথেই বাড়তে থাকে মুসলিম লিগের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রদেশে আগমনের পরেও কি নিম্নবর্নের নমঃশূদ্ররা সামাজিকভাবে সঠিক আসন পাননি।

নিম্নবর্নের উদ্বাস্তু সমস্যা

1947 খ্রীঃ-এ ভারত স্বাধীনতা পায়। এর সাথেই ভারত বিভাজন হয়। বাংলা তথা ভারতের এক অংশ (অধুনা বাংলাদেশ) ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হলেও পূর্ব পাকিস্তানেও বিশাল হিন্দু জনজাতির বসবাস ছিল। 1950 খ্রীঃ পরবর্তীতে এই হিন্দু নাগরিকরা পশ্চিমবঙ্গে শরনার্থী রুপে প্রবেশ করেন। এতে এক বিশাল অংশ নিম্নবর্নীয়রা ছিল। খুব কম সময়ে এক বিশাল জনরাশি পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করলে, অন্তর্বর্তী রাজনৈতিক,সামাজিক অবস্থার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ব্রিটিশ পরবর্তী নতুন ভারত সরকারের সঠিক পরিকাঠামো এবং সামাজিক অবস্থা সুবিধাজনক জায়গায় ছিলনা। এরফলে হঠাৎ আগমনকারী নতুন জনজাতির খাদ্য এবং আশ্রয়ের সংকট দেখা যায়। উচ্চবর্নের কম সংখ্যক মানুষ ইতিমধ্যে তুলনামূলক ভালো আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছিল। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দু উদ্বাস্তুদের আশ্রয় হয় - জাতীয় সড়ক, রেলের ফাঁকা জায়াগা। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করা হয়, গড়ে ওঠে কলোনী। তবুও আরো আগত নতুন শরনার্থী সংখ্যা বাড়তে থাকে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুদের ওপর বেশী দায়িত্ব পালন করেন। বাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করলেও, সার্বিক ভাবে তা সফল হয়নি। ডঃ রায় শরনার্থী শিবির গুলির প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আশ্রয়প্রার্থীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য বিশেষ প্রস্তাব রেপুটেশন করেন। 1948 সালে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ডোমিনিয়ন পার্লামেন্টে পূর্ণ-বসতি অর্থ সাহায্য প্রতিষ্ঠার বিল সম্পর্কে বৈঠক ডাকা হয়। কিন্তু এতে সময় আরো অতিবাহিত হয়। শরনার্থীদের সমস্যা আরো বাড়তে থাকে। অভাব অনটন সহ্য করার পরও হানাহানি, লুণ্ঠণ, শিশু ও মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকে উদ্বাস্তুরা। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মিত্র এই সম্পর্কে বলেন- "অত্যাচারের দরুন অন্ততঃ ২০ লক্ষ লোক পূর্ববঙ্গ

হইতে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। একমাত্র কোলকাতা শহরেই ৬১ লক্ষ রেশনকার্ড ইসু করা হইয়াছে। হয়ত বলা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে ভূঁয়ো রেশন কার্ড রহিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, কলিকাতার জনসংখ্যা বর্তমানে ৫০ লক্ষেরও বেশী। তাহারা শখ করিয়া পিতৃপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন, ঘরবাড়ি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন না, বহু অপমান,নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে বলিয়াই তাহারা চলিয়া আসিতেছে। কায়েদা আজম ফান্ডে চাঁদা আদায়ের নামে জুলুমবাজী, হিন্দুদের নিকট হইতে অত্যধিক হারে আয়কর আদায়, অমুসলমানদের আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া লইয়া সেগুলি মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডদের হস্তে অর্পন ও নারীদের শ্লীলতাহানি গৃহত্যাগের এগুলিই কারণ।"[x]

এই জনরাশির সামাল দিতে পরবর্তীতে উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই জনরাশির বেশীরভাগই ছিল নিম্নবর্ণের। বেশীরভাগই মানুষের বাংলার বাইরে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা হয়। ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রভৃতি বনভূমিতে অনুর্বর জমিতে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা হয়। অনুর্বর পাথুরে জমি এবং চরমভাবাপন্ন পরিবেশে আশ্রয়ের সংস্থানের অপেক্ষা মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারি তার লিখিত গ্রন্থে লিখেছেন -"আমাদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় বাঁকুড়া জেলার শিরোমনিপুর ক্যাম্প। হাত দশেক লম্বা আর হাত পাঁচেক চওড়া লাল লাল তাঁবুর মধ্যে গুঁজে দেওয়া হয় এক-একটি পরিবারকে। পেটে কিছু গোঁজবার জন্য দেওয়া হতে থাকে প্রতি চৌদ্দ দিন পরে কিছু চালের মত জিনিষ আর কিছু টাকার মত জিনিষ। সেই চালের মত জিনিষ দিয়ে ভাত রান্না করলে কেমন টকটক গন্ধ ছাড়ত- খেলে পেটে মেঘ ডাকত। শোনা যায়, একই গুদাম থেকে নাকি তিন গাড়ি চাল বোঝাই করে একটা চিড়িয়াখানা, একটা জেলখানায় আর একটা ক্যাম্পে চলে আসত।"[xi] মনোরঞ্জন ব্যাপারি তার স্মৃতিচারনায় শরনার্থীদের মৃত্যু সম্পর্কেও বলেছেন। তার বর্ননা অনুযায়ী -"... শুন্য থেকে বছর সাতেকের বাচ্চাগুলোর। মোটেই গরম সহ্য করতে পারত না। পটাপট মুরগীর মতো দাপিয়ে মারা যেত। হাজার খানেক মানুষের পরিবার পরিবার নিয়ে শিরোমণিপুর ক্যাম্পে মৃত্যু যেন সেখানে থৈ থৈ করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল কয়েক বছর ধরে। রোজরাতেই কোথাও-না-কোথাও শিশুহারা মায়ের বুকফাটা কান্নায় পরিবেশটাকে ভয়ার্ত আর অসহ্য করে তুলত।"কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বাস্তু আগমনকে প্রথমেই তেমন গুরুত্ব দেয়নি। পূর্ববঙ্গের হিন্দু উদ্বাস্তু আগমন একটি সাময়িক ব্যাপার ভেবেছিলেন। তাই এই জনস্রোত আটকাতে তারা ট্রানসিট ক্যাম্প খোলেন। “The central minister made it clear that he had summoned this meeting to communicate the decisions arrived at in Delhi regarding the refugees from East Pakistan. He related that the central policy would be confined to relief and not to rehabilitation of the new refugees. They would be accommodated in relief camps only temporarily.”[xii]

উচ্চবর্নের মানুষের দেশভাগ পরবর্তী সময়ে তুলনামূলক কম সমস্যা হয়েছিল। পূর্বেই আর্থিক প্রতিপত্তি, ঐতিহ্য এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার মাধ্যমে তাদের এদেশে আশ্রয় এবং খাদ্য সংস্থানের সেরকম অসুবিধা হয়নি। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের খুব কমসংখ্যক মানুষ স্বাক্ষর ছিলেন, বেশীরভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা ছিল -কৃষিকাজ। তাদের শুষ্ক, অনুর্বর স্থানে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অত্যধিক তাপমাত্রা এবং শুষ্কতা- বিপরীতধর্মী আবহাওয়ায় খাপ খাওয়াতে না পেরেও বহু মানুষের মৃত্যু ঘটে। অনাকাঙ্ক্ষিত জনজাতির অত্যধিক হারে মৃত্যুতে সরকারের তেমন কোনো আলোকপাত করেনি। উদ্বাস্তু সমস্যা দিনের পর দিন আরো জটিল এবং ভয়াবহ হতে শুরু করে। কোনো রাজনৈতিক সংগঠন প্রথমাংশে না থাকার কারণে জোরালো প্রতিবাদ সম্ভব হয়নি। যদিও ডঃ রায় বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্বাস্তুদের মূলস্রোতে ফেরানোর চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বিরোধী শক্তির

হস্তক্ষেপ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা না পাওয়ার কারনে পরিকল্পনা গুলি বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি "চেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত বরাবর উদ্বাস্তুদের পুর্নবাসন দিয়ে এক একটি স্বয়ঃসম্পূর্ন গ্রাম গঠন করতে।

সমস্যার সমাধান হয়না উপরন্তু নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুরা আরো সংকটে পড়ে। তারা চাইলেও আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফিরতে পারেনা। একদিকে ভারত সরকারের আভ্যন্তরীণ নীতি , অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের অনুপ্রেরণায় পূর্ব পাকিস্তানে ধর্ম নিরপেক্ষ থেকে "ইসলামীকরন" নীতি শুরু হয়। এর সাথে তখনও যেসব হিন্দু জনজাতি পূর্ব-পাকিস্তানে ছিল তাদের ওপর অত্যাচার এবং ধর্মীয় জোর জুলুম বাড়তে থাকে।

নিম্নবর্ন উদ্বাস্তুদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ-

কোনোভাবেই উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান সম্ভব না হওয়ায়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী নমঃশূদ্র উদ্বাস্তুদের বিপদসঙ্কুল আন্দামানে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। "দন্ডকারণ্য পুর্নবাসন পরিকল্পনার" মাধ্যমে এইসময়ে ৮০হাজার বর্গমাইল জুড়ে সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সেখানে ছোটো ছোটো গ্রাম করে পুর্নবাসনের ব্যবস্থা হয়। কৃষিকাজ উদ্বাস্তুদের প্রধান জীবিকা হওয়ার জন্য তাদের কৃষিজ জমি বণ্টণ করা হয়। নমঃশূদ্র নেতা প্রমথরঞ্জন ঠাকুর প্রথমে বাংলার ভিতরেই কলোনী করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের দাবী জানালে পরবর্তীতে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সরকারের বাংলার বাইরে পুর্নবাসনের স্বপক্ষে কথা বলেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ তিনি নমঃশূদ্র সমাজ সংস্কারক ও অধ্যাপক মনীন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও মহানন্দ হালদারের সাথে আলোচনার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে কংগ্রেসে যোগদান করে। এছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে UCRC উদ্বাস্তু উন্নয়ন স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়। সি.পি.আই.এম নেতা অনিল সিংহের নেতৃত্বে এটি বেশ শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দল মূলত কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে কর্মসূচি কার্যকরী করে।

অন্যদিকে নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল প্রথম অবস্থায় উদ্বাস্তুদের তেমন ভাবে সমর্থন পাননি। দেশভাগের সময়ে তার ভুল সিদ্ধান্তের জন্য মানুষের সমর্থন পেতে তিনি অক্ষম ছিলেন। তিনি নমঃশুদ্রদের পূর্ব পাকিস্তান ছাড়তে বারন করে পরবর্তীতে গোপন দেশত্যাগ "বিশ্বাসঘাতক" রুপে প্রথমে নিম্নবর্নের কাছে প্রতিফলিত হত। পরবর্তীতে বিভিন্ন সভায় উদ্বাস্তুদের জন্য বক্তৃতা এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে উদ্বাস্তুদের পাশে থাকার অঙ্গীকারের জন্য পূর্বের সম্মান ও সমর্থন ফিরে পান। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর ও যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল- এই দুই গুরুত্বপূর্ণ নমঃশূদ্র নেতা উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর যোগেন্দ্রনাথ মন্ডলকে বাংলার বাইরে নমঃশূদ্র পুর্নবাসনের সমর্থন করে কংগ্রেসে যোগদান করার কথা বলেন। কিন্তু তিনি এই পরিকল্পনার সমর্থন না করে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত UCRC তে যোগদান করেন। উদ্বাস্তু সমস্যাতেও এই রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভাজনের মাধ্যমে নমঃশুদ্র উদ্বাস্তুরা সমস্যায় পড়ে - কোন মতাদর্শকে সমর্থন জানাবে।

রাজনৈতিক কার্যকলাপ তৈরীতে একদিকে বাংলার বাইরে পুর্নবাসন আর অন্যদিকে বাংলার মধ্যে কলোনী গড়ার মধ্যে তারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। জমির অভাবে বাংলার মধ্যে থাকা যেমন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল আবার বিপদসঙ্কুল বাংলার বাইরে যাওয়াটাও নিরাপদ ছিলনা তবে সেখানে যথেষ্ট সরকারী অনুদান প্রাপ্তির ঘোষনা করা হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ এই সমস্যার সমাধান আদতে সম্ভব হয়নি। বরং এর মাধ্যমে একতা বিনষ্ট হয়ে বিভেদ আরো স্পষ্ট হয়েছিল।

তথ্যসূত্র-

[i] Dr. Mead, C.S. The Nama Sudras; and the other addresses, Hussey & Gilligham Publishers, South Asian Baptist Furreedpore Mission, 1911.

[ii] Biswas, N.B., Roy, N.R., Education of the Scheduled Caste People Namasudras of West Bengal. Shipra Publication, 2014.

[iii] Chakraborty Prafulla Kr.,Marginal Men, Lumiere Books 1990.

[iv] বিশ্বাস উৎপল, কৃষক মুক্তি প্রশ্নে হরিচাঁদ ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্মের আন্দোলন নিখিল ভারত প্রকাশনী. , 2013, P-131

[v] বর্মন রুপ কুমার, জাতি- রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক ,পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, আলফাবেট বুকস, 2019, 62

[vi] বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০০১.

[vii] আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা মার্চ ১৯৪৮, পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুগণ পুর্নবসতী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া উচিত পার্লামেন্টে লক্ষ্মীকান্ত মিত্রদের বক্তৃতা।

[viii] বাবলু কুমার পাল, বরিশাল থেকে দন্ডকারণ্য পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস, ঊষা প্রেস, 2010, 65

[ix] Ibid P-70

[x] আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা মার্চ ১৯৪৮, পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুগণ পুর্নবসতী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া উচিত পার্লামেন্টে লক্ষ্মীকান্ত মিত্রদের বক্তৃতা।

[xi] সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০০১, পৃ-৪৭

[xii] Prafulla Kr. Chakraborty,Marginal Men, Lumiere Books 1990, p-28

সন্দর্ভ গ্রন্থসূচী-

1. Chakraborty Prafulla Kr.,Marginal Men, Lumiere Books 1990.
2. বিশ্বাস উৎপল, কৃষক মুক্তি প্রশ্নে হরিচাঁদ ঠাকুর, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর, শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর ও মতুয়া ধর্মের আন্দোলন নিখিল ভারত প্রকাশনী. , ২০১৩, পৃ-১৩১।
3. বর্মন রুপ কুমার, জাতি- রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক ,পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান, আলফাবেট বুকস, ২০১৯।
4. বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, দেশভাগ স্মৃতি আর সত্তা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,২০০১।
5. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২রা মার্চ ১৯৪৮, পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগী হিন্দুগণ পুর্নবসতী সাহায্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাওয়া উচিত পার্লামেন্টে লক্ষ্মীকান্ত মিত্রদের বক্তৃতা।
6. পাল বাবলু কুমার, বরিশাল থেকে দন্ডকারণ্য পূর্ববঙ্গের কৃষিজীবি উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন ইতিহাস, ঊষা প্রেস, ২০১০।
7. বিশ্বাস নীতীশ, ভারতে বাঙালি উদ্বাস্তু, ঐকতান গবেষণা সংসদ, 2019।
8. বিশ্বাস মনোশান্ত, বাংলার মতুয়া আন্দোলন সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি, সেতু প্রকাশনী, ২০১৬।